أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/X)

www.motaher21.net

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি,

We have created you middle Ummat.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪৩

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি ‘মধ্যপন্থী’ উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী। প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়তে, তাকে তো কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে উল্টো দিকে ফিরে যায়, আমি শুধু তা দেখার জন্য কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম। এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য মোটেই

কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লাহর হিদায়াত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের এই ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময়।

১৪৩ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] (وسطا) শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (عدل) শব্দ দ্বারা - এর ব্যাখ্যা করেছেন। [বুখারী: ৭৩৪৯] এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আবার (وسط) অর্থ হয় মধ্যবর্তী, মধ্যপন্থী। সে হিসাবে এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং নবী ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, আর আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। [সূরা আল-আরাফ: ১৮১]

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য আলোচিত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাধ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই। অন্য সূরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে। [সূরা আলে-ইমরান:১১০]

অর্থাৎ মুসলিমরা যেমন সব নবীর শ্রেষ্ঠতম নবীপ্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্পপ্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহ্‌ ভীতির সমস্ত শাখা প্রশাখা ত্যাগের বদৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাংখা ও তাদেরকে জান্নাতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। এ সম্প্রদায়টি গণমানুষের হিতাকাংখা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও মুসলিম জাতি এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, ঈমানের ভারসাম্য। পূর্ববতী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা নবীগণকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছেঃ ইয়াহুদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাসারারা বলেছে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। [সূরা আত-তাওবাহঃ ৩০]

অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে নবীর উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের নবী যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন তারা পরিস্কার বলে দিয়েছে, 'আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব' । [সূরা আল-মায়েদাহ:২৪]

আবার কোথাও নবীগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদেরই হাতে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌ই মনে করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তার প্রশংসা এবং গুণগান করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতর থাকে।

তাছাড়া মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে, কর্ম ও 'ইবাদাতের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরীআতের বিধি-বিধানগুলোকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদাত থেকে গা বাচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও ইবাদাত বলে মনে করে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি যুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। মহিলাদের অধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়াদ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীআত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লংঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

তদ্রুপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য। অর্থনীতিতে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখদুরাবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীআত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন

করেছে। ইসলামী শরীআত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

[২] এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল, ১. মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষাদানের যোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য' করা হয়। ২. ইজমা শরীআতের দলীল। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ইজমা (মুসলিম আলেমদের ঐক্যমত) যে শরীআতের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব।

[৩] এ উম্মাত হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল নবীর উম্মতরা তাদের হিদায়াত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌছেনি এবং কোন নবীও আমাদের হেদায়াত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, নবীগণ সবযুগেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আনীত হিদায়াত তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ ‘আলাইহিস সালাম-কে ডেকে বলবেন, হে নূহ আপনি কি আমার বাণী লোকদের কাছে পৌছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তখন তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি তিনি কিছু পৌছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ হে নূহ! আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র বাণী লোকদের কাছে পৌছিয়েছেন। আর রাসূল তখন তোমাদের সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেবেন। এটাই হলো আল্লাহ্র বাণীঃ “এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"। [বুখারীঃ ৪৪৮৭]

[৪] আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, (لِنَعْلَمَ) এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, যাতে আমরা জানতে পারি'। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে কেউ কেউ এটা মনে করতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ বুঝি আগে জানতেন না, ঘটনা ঘটার পরে জানেন। মূলত: এ ধরনের বোঝার কোন অবকাশই ইসলামী শরীআতে নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আগে থেকেই সবকিছু জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জানা বিষয়টি অনুসারে বান্দার কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দিয়ে বান্দার উপর তাঁর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে করে তার জানার উপর ন্যায় বরং বাস্তব ভিত্তিতে তিনি বান্দাকে সওয়াব বা শাস্তি দিতে পারেন। মূলত: এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে

যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত " [সূরা আলে ইমরান ১৫৪] এ আয়াতে 'পরীক্ষা' করার কথা বলার মাধ্যমে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা। এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় আয়াতের শেষে 'আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত' এ কথা বলার মাধ্যমে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র যেমন, সূরা আল-কাহাফ:১২, সাবা ২১ এ ব্যবহৃত (لِنَعْلَمَ) শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

[৫] এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা দ্বীন ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোন কোন মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে সালাত। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মুকাদাসের দিকে মুখ করে যেসব সালাত আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কাবাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুসলিম ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, তারা বায়তুল মোকাদাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে গেছেন - কা'বার দিকে সালাত আদায় করার সুযোগ পাননি, তাদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৪৮৬] এতে সালাতকে ঈমান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, ১. তাদের সব সালাতই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ২. আমল ঈমানের অংগ। ৩. সালাত ঈমানের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, সালাতকে বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এটি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের নেতৃত্বের ঘোষণাবানী। 'এভাবেই' শব্দটির সাহায্যে দু' দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একঃ আল্লাহর পথ প্রদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারীরা সত্য-সরল পথের সন্ধান পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যেখানে তাদেরকে 'মধ্যপন্থী উম্মাত' গণ্য করা হয়েছে। দুইঃ এ সাথে কিব্‌লাহ পরিবর্তনের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বোধরা একদিক থেকে আর একদিকে মুখ ফিরানো মনে করছে। অথচ বাইতুল মাকদিস থেকে কা' বার দিকে মুখ ফিরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পদ থেকে যথানিয়মে হটিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে সে পদে বসিয়ে দিলেন। 'মধ্যপন্থী উম্মাত' শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের অধিকারী। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন দল, যারা নিজেরা ইনসাফ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোন অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই।বলা হয়েছে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে এই যে, "তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন।" এ বক্তব্যের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে যখন সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে তাদের হিসেব নেয়া হবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রসূল তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎকাজ ও সুবিচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে হুবহু এবং পুরোপুরি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর বাস্তবে সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে তোমাদের এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছো। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখাবার ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করোনি।এভাবে কোন ব্যক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে যেমন একদিকে মর্যাদাও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে এ উম্মাতের জন্য আল্লাহভীতি, সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন, সুবিচার, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন তেমনিভাবে এ উম্মাতকেও সারা দুনিয়াবাসীদের জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমন কি তাদের কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হিদায়াত আমাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে যেমন রসূলের দায়িত্ব ছিল বড়ই সুকঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি বা গাফলতি হলে আল্লাহর দরবারে তিনি পাকড়াও হতেন, অনুরূপভাবে এ হিদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহর আদালতে যথার্থই এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই যে, “তোমার রসূলের মাধ্যমে তোমার যে হিদায়াত আমরা পেয়েছিলাম তা তোমার বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার ত্রুটি করিনি” , তাহলে আমরা সেদিন মারাত্মকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবো। সেদিন এ নেতৃত্বের অহংকার সেখানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ত্রুটির কারণে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে যে সমস্ত গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে এবং যত বিপর্যয় ও বিশৃংখলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে---সে সবের জন্য অসৎ নেতৃবর্গ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পাকড়াও হবো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে যখন জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও ভ্রষ্টতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, কে জাহেলী বিদ্বেষ এবং মাটি ও রক্তের গোলামিতে লিপ্ত আর কে এসব বাঁধন মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেছে। একদিকে আরবরা তাদের দেশ, বংশ ও গোত্রের অহংকারে ডুবে ছিল। আরবের কা’ বাকে বাদ দিয়ে বাইরের বাইতুল মাকদিসকে কিব্‌লায় পরিণত করা ছিল তাদের জাতীয়তাবাদের মূর্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাতের শামিল। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলরা ছিল তাদের বংশ পূজার অহংকারে মত্ত। নিজেদের পৈতৃক কিব্‌লাহ ছাড়া অন্য কোন কিব্‌লাহকে বরদাসত করার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মূর্তি যাদের মনের কোণে ঠাঁই পেয়েছে, তারা কেমন করে আল্লাহর রসূল যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন সে পথে চলতে পারতো। তাই মহান আল্লাহ এ মূর্তি পূজারীদের যথার্থ সতপন্থীদের থেকে ছেঁটে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা নিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বাইতুল মাকদিসকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করলেন। এর ফলে আরব জাতীয়তাবাদের দেবতার পূজারীরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এ কিব্‌লাহ বাদ দিয়ে কা’ বাকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেন। ফলে ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের পূজারীরাও তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এভাবে যারা কোন মূর্তির নয় বরং নিছক আল্লাহর পূজারী ছিলেন একমাত্র তারাই রসূলের সাথে রয়ে গেলেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪৪

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

আমরা তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও, এবার তাহলে সেই কিব্‌লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই হও না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো। এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, খুব ভালো করেই জানে, (কিব্‌লাহ পরিবর্তনের) এ হুকুমটি এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি একটি যথার্থ সত্য হুকুম। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা থেকে গাফেল নন।

১৪৪ নং আয়াতের তাফসীর:

কুর’ আনের আয়াতে প্রথম রহিতকরণ হয় কিবলাহ পরিবর্তনের দ্বারা

ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কুর’ আন মাজীদের মধ্যে প্রথম ‘নাসখ’ হচ্ছে কিবলাহর হুকুম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরত করেন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলো ইয়াহুদী। মহান আল্লাহ তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। ইয়াহূদীরা এতে খুবই খুশি হয়। তিনি কয়েক মাস পর্যন্ত এদিকেই সালাত আদায় করেন। কিন্তু স্বয়ং তাঁর মনের বাসনা ছিলো ইব্রাহীম (আঃ)-এর কিবলাহ। তিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রায়ই তিনি আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলন করতেন। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে ইয়াহুদীরা বলতে থাকেঃ

مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ‘কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলো তাদের সেই ক্বিবলা থেকে, যা তারা অনুসরণ করে আসছিলো। উত্তরে মহান বললেনঃ

﴿قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

‘বলো,পূর্ব এবং পশ্চিম মহান আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (২ নং সূরা আল বাকারাহ, আয়াত নং ১৪২, তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১০৩) অতএবঃ

﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ ‘তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই মহান আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান।’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১১৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন যেঃ

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ كُنْتَ عَلَیْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ یَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَیْهِ

‘পূর্বে কিবলাহ ছিলো পরীক্ষামূলক যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছন ফিরে চলে যায়।’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৪৩)

কা ‘বা ঘরই একমাত্র কিবলাহ

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ‘তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও’ তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই থাকো না কেন, সালাতের সময় তোমরা কা ‘বার দিকে মুখ করো।

‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রাঃ) ‘মাসজিদে হারামে’ ‘মীযাবে’ র সামনে বসে فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ ‘মীযাব কা ‘বার দিকে রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরামাহ (রহঃ), সা ‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ), রাবী ‘ ইবনে আনাস (রহঃ) প্রমুখ মনীষীরও উক্তি এটাই। ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) এরও একটি উক্তি এই রয়েছে যে, ঠিক কা ‘বার দিকে মুখ করাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। তার দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মুখ কা ‘বার দিকে হওয়াই যথেষ্ট। আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) ইকরামাহ (রহঃ) সা ‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) রাবী ‘ ইবনে আনাস (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীরও উক্তি এটাই।

ইমাম হাকিম বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কা ‘বাকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। (মুসতাদরাক হাকিম ২/২৬৯)

একটি হাদীসের মধ্যে রয়েছে যেঃ مابينالمشرقوالمغربقبلة ‘পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে কিবলাহ রয়েছে।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম-২/২৬৯, তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১০৭-১০৯)

ইবনে জুরাইজ এর গ্রন্থে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

."ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي

‘পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে কিবলাহ রয়েছে। মাসজিদে হারামের অধিবাসীদের কিবলাহ হচ্ছে বায়তুল্লাহ। হারাম' বাসীদের কিবলাহ হলো মাসজিদ। আর হারাম কিবলাহ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী বাসীর। পূর্বেই থাক বা পশ্চিমেই থাক, সমস্ত উম্মাতের কিবলাহ এটাই। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২/৯/১০)

কিবলাহ পরিবর্তন হয় ‘আসরের সালাতের সময়

আবূ নু ‘আইম বারা’ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। কা ‘বা ঘর তাঁর কিবলাহ হোক এটাই তাঁর মনের বাসনা ছিলো। হুকুম প্রাপ্তির পর তিনি ঐ দিকে মুখ করে প্রথম ‘আসরের সালাত আদায় করেন। যেসব লোক তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একজন লোক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার লোকেরা রুকূ ‘র অবস্থায় ছিলেন। ঐ লোকটি বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাক্কার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি।’ এ কথা শুনামাত্রই ঐ সব লোক ঐ অবস্থায়ই কা ‘বার দিকে মুখ করেন।

সুনান নাসাঈর মধ্যে সা ‘ঈদ বিন মু ‘আল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ফজরের সময় মাসজিদে নাবাবীতে যেতাম এবং তথায় কিছু নফল সালাত আদায় করতাম। একদিন আমরা গিয়ে দেখি যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারের ওপর বসে আছেন। আমি বলি যে আজ নিশ্চয় কোন নতুন কথা হয়েছে। আমিও বসে পরি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন قد نرى تقلب وجهك এই আয়াতটি পাঠ করেন। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলি আসুন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তৃতা শেষ করার পূর্বেই এই নতুন নির্দেশকে কার্যে পরিণতি করি এবং প্রথমেই আমরা আদেশ মান্যকারী হয়ে যাই। এই বলে আমরা একদিকে চলে যাই এবং সর্বপ্রথম বায়তুল্লার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারের ওপর থেকে নেমে আসেন এবং কিবলাহর দিকে মুখ করে সর্বপ্রথম যোহরের সালাত আদায় করেন।

‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা ‘বার দিকে মুখ করে সর্বপ্রথম যে সালাত আদায় করেন তা যোহরের সালাত ছিলো। আর এই সালাতই হচ্ছে সালাতুল উসতা। কিন্তু কা ‘বার দিকে মুখ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম যে ‘আসরের সালাত আদায় করেছেন এটাই বেশি প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। এজন্যই কুবাবাসী পরের দিন ফজরের সালাতে এই সংবাদ পেয়েছিলো।

তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই গ্রন্থে নুওয়াইলা বিনতি মুসলিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ আমরা বানু হারিসার মাসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যোহর বা ‘আসরের সালাত পড়ছিলাম। আমাদের দু’ রাক ‘আত সালাত পড়া হয়ে গেছে, এমন সময় কে একজন এসে কিবলাহ পরিবর্তনের সংবাদ দেয়। ফলে

আমরা সালাতের মধ্যেই বায়তুল্লার দিকে ঘুরে যাই এবং অবশিষ্ট দু' রাক 'আত ঐ দিকেই মুখ করে আদায় করি। সালাতের মধ্যে এইভাবে ফিরে যাওয়ার ফলে পুরুষ লোকেরা স্ত্রী লোকদের স্থানে এবং স্ত্রী লোকেরা পুরুষ লোকদের স্থানে এসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি খুশি হয়ে বলেনঃ এরাই হচ্ছে অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনয়নকারী।

সফরে কিবলার হুকম

মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ﴾ 'আর তোমরা যেখানেই থাকো, এরই দিকে মুখ ফিরাও।' অর্থাৎ তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই থাকো না কেন, সালাতের সময় তোমরা কা 'বার দিকে মুখ করো। তবে সফরে সাওয়ারীর ওপর যে ব্যক্তি নফল সালাত আদায় করে সে সোয়ারী যেদিকেই যাবে সেদিকেই মুখ করে নফল সালাত আদায় করবে। তার মনে গতি কা 'বার দিকে থাকলে যথেষ্ট হবে। এরকমই যে ব্যক্তি যুদ্ধের মাঠে সালাত আদায় করে সে যেভাবে পারে এবং যেদিকে আদায় করা তার জন্য সুবিধাজনক সেদিকে ফিরেই আদায় করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিবলাহর দিক ঠিক করতে পারছে না সে অনুমান করে যে দিকেই কিবলাহ হওয়ার ধারণা তার বেশি হবে সে দিকে ফিরেই সে সালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি প্রকৃতপক্ষেই তার সালাত কিবলাহর দিকে না হয় তবুও তার সালাত আদায় করা হয়ে যাবে এবং সে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা পেয়ে যাবে।

একটি মাস' আলাঃ মালিকীগণ এই আয়াত দ্বারা দালীল গ্রহণ করেছেন যে, সালাত আদায়কারী সালাতের অবস্থায় তার দৃষ্টি সামনের দিকে রাখতে হবে, সাজদার জায়গায় নয়। যেমন ইমাম শাফি 'ঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এরও এটাই মাযহাব। কেননা আয়াতে রয়েছে, মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করো, কাজেই যদি সাজদার জায়গায় মুখ করা যায় তবে কিছু নত হতে হবে এবং এই কৃত্রিমতা, পূর্ণ বিনয় ও নম্রতার উল্টো। কোন কোন মালাকিয়ার এটাও উক্তি রয়েছে যে, দাঁড়ানো অবস্থায় স্বীয় বক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। জামহূর 'উলামারও এটাই উক্তি। কেননা এটাই হচ্ছে পূর্ণ বিনয় ও নম্রতা। অন্য একটি হাদীসেও এ বিষয়টি এসেছে, রুকূ 'র অবস্থায় দৃষ্টি স্বীয় পায়ের স্থানে, সাজদার অবস্থায় নাকের স্থানে এবং التحيات এর সময় ক্রোড়ের প্রতি রাখতে হবে।

ইয়াহুদীরা জানতো যে, পরে কিবলাহ পরিবর্তিত হবে

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, ইয়াহুদীরা কথা যতোই বানিয়ে বলুক না কেন, তাদের মন বলে যে, কিবলাহ পরিবর্তন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়েছে এবং এটা সত্য। কেননা এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু এরা একমাত্র কুফর, অবাধ্যতা, অহঙ্কার এবং হিংসার বশবর্তী হয়েই এটা গোপন করেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্মতে উদাসীন নন।

কিব্‌লাহ পরিবর্তন সম্পর্কিত এটি ছিল মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি ২য় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা' দ বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ একটি দাওয়াত উপলক্ষ্যে বিশর ইবনে বারাআ ইবনে মা' রুর-এর গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে নামাযে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুই রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় রাকাতে হঠাৎ অহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হলো। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ও তাঁর সঙ্গে জামায়াতে শামিল সমস্ত লোক বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা' বার দিকে ঘুরে গেলেন। এরপর মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো। বারাআ ইবনে আযিব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা লোকদের কানে এমন অবস্থায় পৌঁছলো যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথে সবাই সেই অবস্থাতেই কা' বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালিক বলেন, এ খবরটি বনী সালমায় পৌঁছালো পরের দিন ফজরের নামাযের সময়। লোকেরা এক রাকায়াত নামায শেষ করেছিল এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছলোঃ "সাবধান, কিব্‌লাহ বদলে গেছে। এখন কা' বার দিকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট হয়েছে।" একথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামায়াত কা' বার দিকে মুখ ফিরালো।উল্লেখ করা যেতে পারে, বাইতুল মাকদিস মদীনা থেকে সোজা উত্তর দিকে। আর কা' বা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। আর নামাযের মধ্যে কিব্‌লাহ পরিবর্তন করার জন্য ইমামকে অবশ্যি মুকতাদিদের পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে হয়েছে। অন্যদিকে মুকতাদিদের কেবলমাত্র দিক পরিবর্তন করতে হয়নি বরং তাদেরও কিছু কিছু চলাফেরা করে লাইন ঠিকঠাক করতে হয়েছে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়াতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাও এসেছে।আর আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি' এবং 'সেই কিব্‌লাহর দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যাকে তুমি পছন্দ করো' এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কিব্‌লাহ পরিবর্তনের নির্দেশ আসার আগে থেকেই নবী ﷺ এ প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রিয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহীমী কেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাবার সময় এসে গেছে। ' মসজিদে হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে, এমন ইবাদাত গৃহ যার মধ্যস্থলে কা' বাগৃহ অবস্থিত।কা' বার দিকে মুখ করার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকে সোজা নাক বরাবর কা' বার দিকে ফিরে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক জায়গায় সবসময় এটা করা কঠিন। তাই কা' বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সোজা কা' বা বরাবর মুখ করে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কুরআনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব কা' বার নির্ভুল দিক নির্দেশ করার জন্য অনুসন্ধান আমাদের অবশ্যি চালাতে হবে। কিন্তু একেবারেই যথার্থ ও নির্ভুল দিক জেনে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি। সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যে দিকটিতে কা' বার অবস্থিতি হওয়া সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত হতে পারি সেদিকে ফিরে নামায পড়াই নিঃসন্দেহে সঠিক পদ্ধতি। যদি কোথাও কিব্‌লার দিক নির্দেশকরা কঠিন হয়ে পড়ে অথবা এমন অবস্থায় থাকা হয় যার ফলে কিব্‌লার দিকে মুখ করে থাকা সম্ভব না হয় (যেমন নৌকা বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ কালে) তাহলে এ অবস্থায় যে দিকটার কিব্‌লাহ হওয়া সম্পর্কে ধারণা হয় অথবা যেদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া যেতে পারে। তবে, হ্যাঁ, নামাযের মধ্যেই যদি কিব্‌লার সঠিক দিক নির্দেশনা জানা যায় অথবা সঠিক দিকে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে নামায পড়া অবস্থায়ই সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া উচিত।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪৫

وَ لَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۬ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

তুমি এই আহ্‌লি কিতাবদের কাছে যে কোন নিশানীই আনো না কেন, এরা তোমার কিব্‌লার অনুসারী কখনোই হবে না। তোমাদের পক্ষেও তাদের কিব্‌লার অনুগামী হওয়া সম্ভব নয় আর এদের কোন একটি দলও অন্য দলের কিব্‌লার অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা ও বাসনার অনুসারী হও, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪৫ নং আয়াতের তাফসীর:

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা ইয়াহূদীদের কুফরী, অবাধ্যতা ও জেনে-শুনে সত্য ত্যাগের কথা তুলে ধরছেন। তাদের বিষয়টি এমন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা প্রমাণ করার জন্য সকল প্রকার দলিল নিয়ে এলেও তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মেনে নেবে না।

এদের ব্যাপারে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ)

“নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের নিকট সকল নিদর্শন আসে যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।” (সূরা ইউনুস ১০:৯৬-৯৭)

(وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ) “আর তারা পরস্পর একজন অন্যজনের কেবলার অনুসারী নয়”

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিষেধ করছেন তাদের কেবলার অনুকরণ করতে, কারণ তারাই তো একে অপরের কেবলা অনসুরণ করে না।

ইয়াহূদীদের কেবলা হল, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথর (যার ওপর গম্বুজ নির্মিত আছে)। আর খ্রিস্টানদের কেবলা হল, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্বদিক। আহলে কিতাবের এ দু' টি দল যখন আপোষে একটি কেবলার ওপর ঐক্যমত হতে পারে না তাহলে তাদের কাছ থেকে কিভাবে আশা করা যায় যে, তারা মুসলিমদের সাথে একমত হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হুশিয়ার করে আল্লাহ তা 'আলা বলছেন- তুমি যদি ওয়াহী আসার পরেও তাদের অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় যালিমদের মধ্যে শামিল হবে।

এর অর্থ হচ্ছে, কিব্‌লাহ সম্পর্কে এরা যত প্রকার বিতর্ক ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে, যুক্তির মাধ্যমে এদেরকে নিশ্চিত করে এর মীমাংসা করা সম্ভব নয়। কারণ এরা বিদ্বেষ পোষণ ও হঠধর্মিতায় লিপ্ত। কোন প্রকার যুক্ত–প্রমাণের মাধ্যমে এদেরকে এদের কিব্‌লাহ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। নিজেদের দল প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে এরা এই কিব্‌লার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আর তোমরা এদের কিব্‌লাহ গ্রহণ করেও এই ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারবে না। কারণ এদের কিব্‌লাহ একটি নয়। এদের সমস্ত দল একমত হয়ে কোন একটি কিব্‌লাহ গ্রহণ করেনি, যেটি গ্রহণ করে নিলে সব ঝগড়া চুকে যেতে পারে। এদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কিব্‌লাহ। একটি দলের কিব্‌লাহ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। অন্যদের সাথে ঝগড়া তখনো থেকে যাবে। আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নবী হিসেবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে থাকা এবং দেয়া নেয়ার নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে আপোষ করা তোমাদের দায়িত্ব নয়। তোমাদের কাজ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি, সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে একমাত্র তারই ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তা থেকে সরে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে নিজের নবুওয়াতের মর্যাদার প্রতি জুলুম করা হবে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তোমাকে আমি যে নিয়ামত দান করেছি তার প্রতি হবে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

ইয়াহুদীদের একগুয়েমী এবং অবাধ্যতা

অত্র আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের কুফর, অবাধ্যতা, বিরোধিতা এবং দুষ্টমির সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের নিকট সর্বপ্রকারের দালীল পেশ করা সত্ত্বেও তারা সত্যের অনুসরণ করবে না। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَۙ﴿۹۶﴾ وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ﴾

‘নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কখনোই ঈমান আনবে না, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায় যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।’ (১০ নং সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৯৬-৯৭) আর এজন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেছেনঃ

﴿وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾

“আর যদি তুমি কিতাবধারীদের সামনে সমুদয় দালীল হাজির করো, তবুও তারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না। আর তুমিও তাদের ক্বিবলার অনুসরণকারী নও। আর তারা একে অপরের ক্বিবলার অনুসরণকারী নয়।”

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে বলেনঃ

﴿وَ مَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾ ‘আর তুমিও তাদের ক্বিবলার অনুসরণকারী নও।’ এটা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা যে, তিনি স্বীয় রাসূলের ওপর যে আদেশ-নিষেধ করেছেন তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্ণ আনুগত্য রয়েছে। যেমন তারা তাদের প্রবৃত্তি এবং নিজস্ব মতবাদের ওপর সন্তুষ্ট রয়েছে, তেমনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও তার আনুগত্যে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনে সদা সুদৃঢ়। তিনি তার জীবন চলার পথে কোথাও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন না। অতএব তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ করে সালাত আদায় করতে পারেন না কেননা তা ইয়াহুদীদের কিবলাহ। আর যা কিছুই ঘটেছে তা মহান আল্লাহ্‌র আদেশেই ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে ‘আলিমগণকেই যেন ধমক দিয়ে বলছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর কারো পিছনে লেগে থাকা এবং নিজের অথবা অন্যদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রকাশ্য অত্যাচারই বটে। কেননা ‘আলিমগণই হলেন অন্যের ওপর হুজ্জাত বা দালীল।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আহলে কিতাবের অধিকাংশ লোকই জেনেশুনে কুফরী করে।

২. যারা সঠিক পথ গ্রহণ করার তাদের জন্য অল্প বুঝই যথেষ্ট।

৩. অধিকাংশ মানুষ সঠিক পথ পরিত্যাগ করলেই আমিও ত্যাগ করব এ নীতি ভ্রান্ত নীতি।